#RiseWithRICE

RICE IAS

প্রত্যাশিত

MAINS TOPIC

DEEP ANALYSIS

for

IAS মেইনস পরীক্ষা

From

13th April to 18th April 2026

সূচক

1. **সাধারণ অধ্যয়ন ১** — **01**
   - 1.1. সংস্কৃতি — 01
     - 1.1.1. সুভাষচন্দ্র বসুর বৌদ্ধিক ও রাজনৈতিক দর্শন — 01
   - 1.2. ভূগোল — 04
     - 1.2.1. ভারতের খনি খাত — 04

2. **সাধারণ অধ্যয়ন ২** — **09**
   - 2.1. রাষ্ট্রনীতি ও শাসনব্যবস্থা — 09
     - 2.1.1. শবরীমালা মন্দির প্রবেশ মামলা এবং রিভিউ পিটিশন — 09
     - 2.1.2. মৃত্যুদণ্ড এবং "মধ্যপন্থা" — 12

3. **সাধারণ অধ্যয়ন ৪** — **16**
   - 3.1. নীতিশাস্ত্র — 16
     - 3.1.1. সম্মতির ঊর্ধ্বে: ক্ষমতা, আইনি অস্পষ্টতা এবং নির্যাতনের নৈতিক মাত্রা — 16

***

Scan to know more about our courses...

IAS 2-Year GS PCM | **IAS 10-Month GS PCM** | **Degree + IAS** | **Prelims Test Series**

সাধারণ অধ্যয়ন ১

1.1. সংস্কৃতি

1.1.1. সুভাষচন্দ্র বসুর বৌদ্ধিক ও রাজনৈতিক দর্শন

ভূমিকা

সুভাষচন্দ্র বসু কেবল একজন জাতীয়তাবাদী নেতাই ছিলেন না, বরং তিনি একজন অত্যন্ত গভীর রাজনৈতিক চিন্তাবিদও ছিলেন। তিনি প্রাচ্যের **আধ্যাত্মিকতা** এবং পাশ্চাত্যের **বস্তুবাদের** মধ্যে একটি সমন্বয় ঘটানোর চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর চিন্তাধারা আদর্শবাদ → বাস্তববাদ → **সংগ্রামী সক্রিয়তাবাদের** একটি বিবর্তনকে তুলে ধরে।

১. দার্শনিক ভিত্তি: বেদান্ত থেকে দ্বন্দ্বমূলক তত্ত্ব

বসুর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড তাঁর গভীর দার্শনিক বিবর্তনের দ্বারা পরিচালিত ছিল, যা বিমূর্ত আধ্যাত্মিকতা থেকে **"বিপ্লবী বাস্তববাদে"** রূপান্তরিত হয়েছিল।

- **মায়াবাদ বর্জন:** শুরুতে শঙ্করাচার্যের বেদান্তের অনুসারী হলেও, বসু পরবর্তীকালে **মায়াবাদ** (জগত একটি বিভ্রম)—এই ধারণাকে বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ মনে করেন। তিনি যুক্তি দেন যে, যদি জগতই মিথ্যা বা বিভ্রম হয়, তবে স্বাধীনতার সংগ্রামের নৈতিক গুরুত্ব হারিয়ে যায়।
- **আত্মার বাস্তবতা:** তাঁর আত্মজীবনী *"অ্যান ইন্ডিয়ান পিলগ্রিম" (১৯৩৭)*-এ তিনি এই বিশ্বাসের দিকে ঝুঁকেছিলেন যে, জগত হলো পরম **আত্মার** একটি প্রকাশ। তিনি এই বাস্তবতার মূল প্রকৃতিকে **"ভালোবাসা"** হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেছিলেন।
- **হেগেলীয় প্রভাব:** বসু হেগেলের **দ্বন্দ্বমূলক তত্ত্ব** (তত্ত্ব + প্রতিতত্ত্ব = সমন্বয়)-কে অগ্রগতির নিয়ম হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে ভারতের লক্ষ্য হলো প্রাচ্যের আধ্যাত্মিকতা এবং পাশ্চাত্যের **বস্তুগত গতিশীলতার** মধ্যে একটি "উচ্চতর সমন্বয়" খুঁজে বের করা।

২. সাম্যবাদ: সৌহার্দ্যপূর্ণ সমতার আদর্শ

বসু চাননি ভারত অন্ধভাবে পাশ্চাত্যের কোনো মতাদর্শকে অনুকরণ করুক। পরিবর্তে, তিনি **"সাম্যবাদ"**—নামক একটি নিজস্ব সমাজতান্ত্রিক কাঠামোর প্রস্তাব করেছিলেন।

- **ব্যুৎপত্তি:** এটি সংস্কৃত শব্দ **'সাম্য'** (সমতা/মিল) এবং **'বাদ'** (মতবাদ) থেকে উদ্ভূত।
- **তৃতীয় পথ:** বসু ফ্যাসিবাদ এবং কমিউনিজমকে বিবর্তনের প্রক্রিয়ার দুটি ভিন্ন পর্যায় হিসেবে দেখেছিলেন। তিনি এমন একটি সমন্বয়ের প্রস্তাব করেছিলেন যা কমিউনিজমের **অর্থনৈতিক পরিকল্পনা** ও **সামাজিক সমতাকে** গ্রহণ করবে, কিন্তু একই সাথে **জাতীয়তাবাদী শৃঙ্খলা** এবং সাংস্কৃতিক পরিচয়কেও বজায় রাখবে।
- **বিশ্বব্যাপী লক্ষ্য:** তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ *"দ্য অ্যান্টি-ইম্পেরিয়ালিস্ট স্ট্রাগল অ্যান্ড সাম্যবাদ" (১৯৩৩)*-এ তিনি দাবি করেছিলেন যে, যেভাবে ফ্রান্স "স্বাধীনতা" এবং ইংল্যান্ড "সাংবিধানিকতা" দিয়েছে, বিশ্বের কাছে ভারতের অবদান হবে **সাম্যবাদের** বাস্তবায়ন।

৩. অর্থনৈতিক ভাবনা: বৈজ্ঞানিক আধুনিকীকরণ

বসু ছিলেন **বৃহৎ শিল্পের** একজন কট্টর সমর্থক, যা অনেক ক্ষেত্রে গান্ধীজির "গ্রামীণ অর্থনীতি" মডেলের বিপরীত ছিল।

- **জাতীয় পরিকল্পনা:** ১৯৩৮ সালে হরিপুরা অধিবেশনে কংগ্রেসের সভাপতি হিসেবে তিনি **ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিটি** (যার প্রধান ছিলেন নেহেরু) গঠন করেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে একমাত্র **"বৈজ্ঞানিক ব্লুপ্রিন্ট"**-এর মাধ্যমেই দারিদ্র্য দূর করা সম্ভব।
- **পুনর্গঠনের মূল ভিত্তি:**
  1. উৎপাদন ও বণ্টনের ওপর **সামাজিক মালিকানা** ও নিয়ন্ত্রণ।
  2. **জমিদারি প্রথা** বিলোপ।
  3. কৃষি কাজে **বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির** প্রয়োগ।
  4. কুটির শিল্পের পাশাপাশি **ভারী শিল্পের** বিকাশ।

৪. রাজনৈতিক চর্চা: "শক্তিশালী রাষ্ট্র" তত্ত্ব

একটি পরাধীন দেশের ক্ষমতা হস্তান্তরের বিষয়ে বসুর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল বিতর্কিত কিন্তু বাস্তবসম্মত।

- **আদর্শ সংঘ:** তিনি বিশ্বাস করতেন যে স্বাধীনতার পরপরই ভারতের মতো একটি খণ্ডিত এবং দরিদ্র দেশ ধীরগতির **বিকেন্দ্রীভূত গণতন্ত্র** সামলাতে পারবে না।
- **সাময়িক একনায়কত্ব:** তিনি "পুনর্গঠনের সময়ের" জন্য পূর্ণ ক্ষমতাসম্পন্ন একটি **শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকারের** পক্ষে সওয়াল করেছিলেন। তিনি কামাল আতাতুর্কের তুরস্ক এবং সোভিয়েত রাশিয়ার দ্রুত পরিবর্তনের উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছিলেন যে আধুনিকীকরণে কেন্দ্রীয় শাসনের কার্যকারিতা কতটা বেশি।
- **স্বাধীনতার সংজ্ঞা:** বসুর কাছে স্বাধীনতা মানে কেবল রাজনৈতিক মুক্তি ছিল না; এটি ছিল **জাতীয়তাবাদ**, বর্ণভেদ প্রথা দূরীকরণ এবং সম্পদের বৈষম্য দূর করার একটি মাধ্যম।

৫. তুলনামূলক বিশ্লেষণ: বসু বনাম গান্ধী

বৈশিষ্ট্য	মহাত্মা গান্ধী	সুভাষচন্দ্র বসু
মতাদর্শ	আধ্যাত্মিকতা এবং নৈতিক আদর্শবাদ	বিপ্লবী বাস্তববাদ এবং সমন্বয়বাদ
পদ্ধতি	চরম অহিংসা (অহিংসা)	শক্তি প্রয়োগকে নৈতিক প্রয়োজন মনে করতেন
অর্থনীতি	বিকেন্দ্রীভূত, গ্রামীণ (চরকা)	কেন্দ্রীয়, শিল্পভিত্তিক (পরিকল্পনা)
রাষ্ট্র	রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার বিষয়ে সন্দিহান ছিলেন	শক্তিশালী কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রে বিশ্বাসী ছিলেন

সুভাষচন্দ্র বসুর বুদ্ধিবৃত্তিক ও রাজনৈতিক দর্শনের সমালোচনামূলক মূল্যায়ন

১. শক্তি বা সবল দিক: স্বপ্নদ্রষ্টা বাস্তববাদী

- **সমাজতন্ত্রের ভারতীয়করণ:** তিনি পাশ্চাত্যের মার্কসবাদকে অন্ধভাবে গ্রহণ না করে বরং ভারতীয় ঐতিহ্যের সাথে যুক্ত করে **সাম্যবাদকে** "সৌহার্দ্যপূর্ণ সমতা" হিসেবে তুলে ধরেন। এটি সমাজতন্ত্রকে এদেশের মানুষের কাছে সহজবোধ্য করে তোলে।
- **পরিকল্পনার স্থপতি:** স্বাধীনতার অনেক আগেই তিনি বুঝেছিলেন যে অর্থনৈতিক শক্তি ছাড়া রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্থহীন। ১৯৩৮ সালে **ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিটি** গঠন করে তিনি জাতীয় আন্দোলনকে নিছক প্রতিবাদ থেকে **দেশ গড়ার** দিকে চালিত করেন।

- **সামাজিক অন্তর্ভুক্তি:** তাঁর স্বাধীনতার ধারণা ছিল অত্যন্ত আধুনিক। তিনি জাতিভেদ প্রথা ও সাম্প্রদায়িকতা সম্পূর্ণ নির্মূল করার ডাক দেন এবং সশস্ত্র সংগ্রামে নারীদের (যেমন: **ঝাঁসি রানী রেজিমেন্ট**) অংশগ্রহণের পথপ্রদর্শক ছিলেন।
- **বাস্তবসম্মত ভূ-রাজনীতি:** তিনি "শত্রুর শত্রু বন্ধু হয়"—এই নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। আন্তর্জাতিক শক্তিগুলোকে কাজে লাগিয়ে তিনি ভারতের স্বার্থ হাসিল করতে চেয়েছিলেন, যা তাঁকে একজন দক্ষ **কূটনীতিবিদ** হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে।

২. **দুর্বলতা বা সীমাবদ্ধতা: একনায়কতন্ত্রের ঝুঁকি**

- **একনায়কত্বের ফাঁদ:** পুনর্গঠনের জন্য তাঁর "শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার" এবং নিরঙ্কুশ ক্ষমতার দাবি সমালোচনার মুখে পড়ে। ইতিহাস বলে যে **"সাময়িক একনায়কত্ব"** প্রায়ই স্থায়ী হয়ে যায়, যা নাগরিক স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে ধ্বংস করে।
- **বৈচিত্র্যের অবমূল্যায়ন:** বসুর এই কেন্দ্রীয় শাসন মডেল ভারতের বিশাল ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে হয়তো উপেক্ষা করেছিল। ভারতের মতো বিচিত্র দেশে সংবিধান যে **যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো** দিয়েছে, তা হয়তো বসুর অতি-কেন্দ্রীয় ব্যবস্থায় সংকটে পড়ত।
- **সমন্বয়ের জটিলতা:** সমালোচকদের মতে, ফ্যাসিবাদ এবং কমিউনিজমের সমন্বয় ঘটানো আদর্শগতভাবে একটি স্ববিরোধী প্রচেষ্টা। কারণ এই দুটি ব্যবস্থারই ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং রাষ্ট্রের ক্ষমতা নিয়ে একেবারে ভিন্ন ও বিপরীত ধারণা ছিল।
- **জনভিত্তি থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ঝুঁকি:** গান্ধীজির **অহিংসা** এবং গ্রামীণ ক্ষমতায়নের বদলে সশস্ত্র সংগ্রাম ও শিল্পায়নকে বেশি গুরুত্ব দেওয়ার ফলে তিনি হয়তো ভারতের বিশাল কৃষক সমাজ থেকে কিছুটা দূরে সরে যাওয়ার ঝুঁকিতে ছিলেন।

ভারতের জন্য বসুর মতাদর্শের সমসাময়িক প্রাসঙ্গিকতা

- **অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্ব এবং "আত্মনির্ভর ভারত":** বসুর "বৈজ্ঞানিক বৃহৎ উৎপাদন"-এর দাবি বর্তমান যুগের **মেক ইন ইন্ডিয়া** এবং **পিএলআই (PLI) স্কিমগুলোর** মধ্যে প্রতিফলিত হয়। তাঁর কৌশলগত দূরদর্শিতার উত্তরাধিকার আজ **নীতি আয়োগের** (NITI Aayog) মাধ্যমে অব্যাহত রয়েছে, যা মূলত তাঁর তৈরি ১৯৩৮ সালের ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিটিরই একটি বিবর্তিত রূপ।
- **কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন এবং বহুমুখী জোট (Multi-Alignment):** তাঁর বাস্তববাদী "জাতীয় স্বার্থ আগে" কূটনৈতিক নীতি ভারতের বর্তমান **কৌশলগত স্বায়ত্তশাসনের** (Strategic Autonomy) পথপ্রদর্শক। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ওপর তাঁর বিশেষ গুরুত্ব আজ ভারতের **অ্যাক্ট ইস্ট পলিসি** (Act East Policy) এবং **কোয়াড** (QUAD)-এ অংশগ্রহণের একটি প্রধান ভিত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে।
- **সামাজিক প্রকৌশল এবং অন্তর্ভুক্তি:** আজাদ হিন্দ ফৌজের (INA) সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মডেল জাতীয় সংহতির জন্য একটি চিরন্তন রূপরেখা প্রদান করে। তাঁর প্রতিষ্ঠিত **ঝাঁসি রানী রেজিমেন্ট** মূলত 'নারী শক্তি'র যে স্বপ্ন দেখেছিল, তা আজ ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীতে নারীদের **পার্মানেন্ট কমিশন** প্রদানের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে।
- **শাসনব্যবস্থা এবং "শক্তিশালী রাষ্ট্র" বিতর্ক:** প্রশাসনিক দক্ষতার ওপর তাঁর জোর দেওয়া বর্তমান সরকারের **"মিনিমাম গভর্নমেন্ট, ম্যাক্সিমাম গভর্নেন্স"** সংস্কার কর্মসূচির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। পরিকাঠামো এবং ভূমি সংস্কারের বাধাগুলো দূর করতে "নির্ণায়ক নির্বাহী ক্ষমতা" বা শক্তিশালী নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আজও ভারতে আলোচনা হয়।
- **প্রযুক্তি এবং শাসন:** একজন আধুনিকমনা মানুষ হিসেবে বসু সামাজিক সমস্যা সমাধানে বিজ্ঞানের প্রয়োগের পক্ষে সওয়াল করেছিলেন। তাঁর সেই দৃষ্টিভঙ্গি আজ **ডিজিটাল ইন্ডিয়া**-র মাধ্যমে প্রকাশিত হচ্ছে, যেখানে UPI এবং **ডাইরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফার** (DBT)-এর মতো মাধ্যমগুলো সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে একটি "বৈজ্ঞানিক ব্লুপ্রিন্ট" হিসেবে কাজ করছে।
- **জাতীয় চরিত্র ও শৃঙ্খলা:** বসু দেশ পুনর্গঠনের জন্য একটি সুশৃঙ্খল **"আদর্শ সংঘ"**-এর ওপর জোর দিয়েছিলেন। কর্তব্যপরায়ণতা এবং সুশৃঙ্খল নাগরিকত্বের এই ধারণা আজকের **মৌলিক কর্তব্য** সচেতনতা এবং NCC/NSS-এর মাধ্যমে যুবশক্তিকে দেশ গড়ার কাজে লাগানোর প্রচেষ্টার সাথে গভীরভাবে মিলে যায়।

উপসংহার

নেতাজীর **বেদান্তিক আদর্শবাদ** এবং **বৈজ্ঞানিক আধুনিকতাবাদের** সমন্বয় একটি স্বনির্ভর ভারতের মূল ভিত্তি। তাঁর কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন, সামাজিক সম্প্রীতি এবং শিল্প পরিকল্পনার উত্তরাধিকার ভারতকে একটি উন্নত ও অন্তর্ভুক্তিমূলক **মহাশক্তি** হয়ে ওঠার পথে আজও প্রেরণা জোগাচ্ছে।

Q. Subhas Chandra Bose's concept of Samyavada was an attempt to synthesize Eastern spiritual philosophy with Western political ideologies. Critically examine its relevance and limitations in the context of modern democratic India. 15 Marks

1.2. ভূগোল

1.2.1. ভারতের খনি খাত

ভূমিকা

ভারতের শিল্প অর্থনীতির **মেরুদণ্ড** হিসেবে খনি খাত বিদ্যুৎ, ইস্পাত এবং সিমেন্টের মতো মূল ক্ষেত্রগুলোতে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সরবরাহ করে। ভারতকে **৫ ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতি** হিসেবে গড়ে তোলা এবং ২০৭০ সালের মধ্যে **'নেট জিরো'** লক্ষ্য অর্জনের জন্য, এই খাতটি এখন কয়লা বা লৌহ আকরিকের মতো ভারী খনিজ থেকে সরে এসে **লিথিয়াম** এবং **কোবাল্টের** মতো **কৌশলগত এবং গুরুত্বপূর্ণ খনিজের** দিকে বেশি নজর দিচ্ছে।

ভারতের খনি খাতের গুরুত্ব

১. **অর্থনৈতিক গুরুত্ব: "উন্নয়নের প্রধান ইঞ্জিন"**

- **জিডিপি এবং শিল্পের প্রভাব:** এটি দেশের মোট **জিডিপিতে ২.২% থেকে ২.৫%** অবদান রাখে এবং **শিল্প উৎপাদন সূচকে** (IIP) এর অবদান প্রায় **১০% থেকে ১১%**।
- **গুণক প্রভাব (Multiplier Effect):** খনি খাতে **১% বৃদ্ধি** উৎপাদন বা ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে প্রায় **১.২% থেকে ১.৫% বৃদ্ধি** ঘটায়।
- **রাজস্ব আয়:** এটি রাজ্য সরকারগুলোর আয়ের একটি বড় উৎস, যা **রয়্যালটি**, নিলাম এবং **ডিস্ট্রিক্ট মিনারেল ফাউন্ডেশন** (DMF)-এর মাধ্যমে সংগৃহীত হয়।

২. **কৌশলগত গুরুত্ব: জ্বালানি ও নিরাপত্তা**

- **কাঁচামাল নিরাপত্তা:** এটি মূল শিল্পগুলোর জন্য প্রাথমিক কাঁচামাল সরবরাহ করে—যেমন ইস্পাতের জন্য **লৌহ আকরিক**, বিদ্যুতের জন্য **তাপবিদ্যুৎ কয়লা** (২০২৬ সালের চাহিদার ৭০%) এবং অবকাঠামোর জন্য **চুনাপাথর**।
- **পরিবেশবান্ধব রূপান্তর:** এটি ইভি (EV) ব্যাটারি, সোলার প্যানেল এবং সেমিকন্ডাক্টরের জন্য **লিথিয়াম, কোবাল্ট এবং রেয়ার আর্থ এলিমেন্ট** (REEs) সরবরাহ করে ২০৭০ সালের মধ্যে **নেট-জিরো** লক্ষ্য পূরণে সাহায্য করছে।
- **কৌশলগত স্বনির্ভরতা:** উচ্চ-প্রযুক্তি এবং প্রতিরক্ষা সরবরাহ ব্যবস্থাকে সুরক্ষিত করতে এটি আমদানির ওপর (বিশেষ করে চীনের ওপর) নির্ভরতা কমায়।

৩. **সামাজিক ও আঞ্চলিক গুরুত্ব**

- **কর্মসংস্থান:** এই খাতে সরাসরি **১০ লক্ষ** মানুষ এবং পরোক্ষভাবে প্রায় **১ থেকে ১.৫ কোটি** মানুষ কাজ করে, যা দুর্গম এলাকার শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ দেয়।
- **আঞ্চলিক উন্নয়ন:** ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড এবং ছত্তিশগড়ের মতো আদিবাসী ও অনগ্রসর অঞ্চলগুলোতে এটি রাস্তাঘাট, রেল এবং স্কুলের মতো **অবকাঠামো উন্নয়নে** সাহায্য করে।
- **সামাজিক কল্যাণ:** PMKKKY প্রকল্পের আওতায় খনি প্রভাবিত এলাকার মানুষের স্বাস্থ্যসেবা, পানীয় জল এবং শিক্ষার জন্য DMF তহবিল ব্যবহার করা হয়।

ভারতের খনি খাতের ভৌগোলিক বন্টন

ভারত বৈচিত্র্যময় ভূ-তাত্ত্বিক সম্পদে সমৃদ্ধ। এর খনিজ সম্পদ মূলত নিচের অঞ্চলগুলোতে ঘনীভূত:

- **উত্তর-পূর্ব মালভূমি অঞ্চল:** ঝাড়খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ এবং ওড়িশা। এখানে প্রচুর পরিমাণে **লৌহ আকরিক, কয়লা, ম্যাঙ্গানিজ এবং বক্সাইট** পাওয়া যায়।
- **দক্ষিণ-পশ্চিম মালভূমি অঞ্চল:** কর্ণাটক, গোয়া এবং তামিলনাড়ুর কিছু অংশ। এখানে উচ্চমানের **লৌহ আকরিক এবং ম্যাঙ্গানিজ** পাওয়া যায়।
- **উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল:** রাজস্থান এবং গুজরাট। এই অঞ্চলটি দস্তা, সিসা, রূপা এবং জিপসামের মতো **অ-লৌহঘটিত খনিজের** জন্য পরিচিত।
- **হিমালয় অঞ্চল:** এখানে তামা, সিসা, দস্তা এবং মূল্যবান পাথর পাওয়া যায়, যদিও পরিবেশগত সংবেদনশীলতার কারণে এগুলো এখনো সেভাবে উত্তোলন করা হয়নি।

ভারতের খনি খাতের আইনগত এবং নীতিগত কাঠামো

১. সাংবিধানিক বিধান

- **রাজ্য তালিকা (Entry 23):** নিজ নিজ সীমানার মধ্যে খনিজ সম্পদের মালিকানা **রাজ্য সরকারের**।
- **কেন্দ্রীয় তালিকা (Entry 54):** জনস্বার্থে খনি ও খনিজ উন্নয়নের নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা **কেন্দ্রীয় সরকারের** হাতে।
- **কেন্দ্রীয় তালিকা (Entry 57):** দেশের সমুদ্রসীমা বা EEZ এবং মহীসোপানের খনিজ নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন।

২. MMDR (সংশোধনী) আইন, ২০২৫: সাম্প্রতিক সংস্কার

- **NMET-এর সম্প্রসারণ:** এর নাম বদলে **"ন্যাশনাল মিনারেল এক্সপ্লোরেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ট্রাস্ট"** করা হয়েছে, যা এখন দেশের বাইরে এবং সমুদ্রে খনিজ অনুসন্ধানে অর্থায়ন করতে পারবে।
- **সংলগ্ন এলাকা (Contiguous Areas):** খনিজ সম্পদ যাতে আটকে না থাকে, সেজন্য লিজ গ্রহীতারা নিলাম ছাড়াই তাদের এলাকা বাড়াতে পারবেন (মাইনিং লিজের জন্য **১০%** এবং কম্পোজিট লাইসেন্সের জন্য **৩০%**)।
- **ক্যাপটিভ মাইনিং-এ নমনীয়তা:** নিজস্ব ব্যবহারের খনি (Captive Mines) থেকে খনিজ বিক্রির সীমা তুলে দেওয়া হয়েছে; এখন অতিরিক্ত উৎপাদন **খোলা বাজারে** বিক্রি করা যাবে।

৩. MMDR (সংশোধনী) আইন, ২০২৩: কৌশলগত পরিবর্তন

- **গুরুত্বপূর্ণ খনিজ:** লিথিয়াম, কোবাল্ট এবং REEs-সহ **২৪টি খনিজকে "গুরুত্বপূর্ণ ও কৌশলগত"** হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।
- **বেসরকারি প্রবেশ:** লিথিয়াম এবং টাইটানিয়ামের মতো ছয়টি খনিজকে "পারমাণবিক" তালিকা থেকে সরিয়ে **বেসরকারি খনির** জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে।

- **এক্সপ্লোরেশন লাইসেন্স (EL):** সোনা ও তামার মতো **গভীর স্তরের খনিজ (Deep-Seated Minerals)** অনুসন্ধানে ছোট আধুনিক সংস্থাগুলোকে উৎসাহিত করতে নতুন লাইসেন্স চালু করা হয়েছে।

৪. **জাতীয় খনিজ নীতি (NMP), ২০১৯**

- **শিল্পের মর্যাদা:** খনি খাতকে **"শিল্পের মর্যাদা"** দেওয়া হয়েছে যাতে তারা সহজে বাণিজ্যিক ঋণ পেতে পারে।
- **প্রজন্মগত সমতা (Inter-generational Equity):** ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য খনিজ সম্পদের স্থায়িত্ব নিশ্চিত করার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।
- **অগ্রাধিকারের অধিকার (Right of First Refusal):** যারা অনুসন্ধান করবে, তাদের নিলামে অগ্রাধিকার বা প্রিমিয়ামের অংশ দিয়ে উৎসাহিত করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।

৫. **অফশোর এরিয়া মিনারেল আইন, ২০২৩**

- **নিলাম ব্যবস্থা:** সমুদ্রের খনিজের জন্য পুরনো বরাদ্দের বদলে **প্রতিযোগিতামূলক নিলাম** ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।
- **কম্পোজিট লাইসেন্স:** সমুদ্র এলাকায় অনুসন্ধান এবং উত্তোলনের জন্য একটি **একক পারমিট**।
- **স্থায়ী মেয়াদ:** দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগের নিশ্চয়তা দিতে উৎপাদনের লিজ **৫০ বছরের** জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

৬. **প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা**

- **DMF এবং PMKKKY:** খনি অঞ্চলের মানুষের কল্যাণে রয়্যালটির **১০-৩০%** অর্থ ব্যয় করার বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা।
- **স্টার রেটিং:** পরিবেশগত এবং সামাজিক নিয়ম মানার ওপর ভিত্তি করে খনিগুলোর **মান যাচাই** করার পদ্ধতি।
- **সশক্ত (Sashakt) পোর্টাল:** বেআইনি খনন রুখতে এবং স্বচ্ছতা বজায় রাখতে **স্যাটেলাইট নজরদারি (MSS)** ভিত্তিক ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম।

ভারতের খনি খাতের প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ

১. **নিয়ন্ত্রণমূলক এবং প্রশাসনিক বাধা**

- **অনুমোদনে বিলম্ব:** পরিবেশগত (EC) এবং বনজ (FC) ছাড়পত্র পাওয়ার ক্ষেত্রে একটি কার্যকর "সিঙ্গেল উইন্ডো" বা এককালীন ব্যবস্থার অভাব রয়েছে। এর ফলে খনিজ আবিষ্কার থেকে উত্তোলন পর্যন্ত প্রকল্পগুলো প্রায় **৫-৮ বছর** পিছিয়ে যায়।
- **নিয়ন্ত্রণমূলক ঝুঁকি ও সংঘাত:** আমলাতান্ত্রিক জটিলতা এবং কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে রাজনৈতিক অগ্রাধিকারের পার্থক্য আইনি লড়াইয়ের ঝুঁকি তৈরি করে এবং নিলাম প্রক্রিয়া বা লিজ নবায়নে বিলম্ব ঘটায়।

২. **পরিবেশগত এবং বাস্তুসংস্থানগত অবনতি**

- **জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি:** ওড়িশা এবং ঝাড়খণ্ডের মতো ঘন বন অঞ্চলে খনির কাজের ফলে ব্যাপক **বন উজাড়**, বাসস্থানের বিভাজন এবং স্থানীয় উদ্ভিদ ও প্রাণীর বিনাশ ঘটছে।
- **দূষণ ও বর্জ্য:** অ্যাসিড মাইন ড্রেনেজ (AMD) এবং অবৈজ্ঞানিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনাই জলাশয়গুলোকে দূষিত করে এবং জমির গুণমান নষ্ট করে। এছাড়া খনির ধুলো বাতাসের মানের ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলে।

৩. **সামাজিক সংঘাত এবং আদিবাসী কল্যাণ**

- **সম্পদের অভিশাপ (Resource Curse):** খনিজ সমৃদ্ধ রাজ্যগুলো উচ্চ দারিদ্র্যের হারের শিকার। অপর্যাপ্ত পুনর্বাসন এবং সনাতনী জীবিকা হারানোয় স্থানীয়দের মধ্যে ক্ষোভ জন্মে, যা **বামপন্থী চরমপন্থা (LWE)** বা নকশালবাদকে উৎসাহিত করে।

- **মানবাধিকার উদ্বেগ:** উত্তর-পূর্ব ভারতে "র‍্যাট-হোল" (Rat-hole) মাইনিংয়ের মতো অবৈধ কাজ চলছে, যেখানে কোনো সুরক্ষা বিধি না মেনেই অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় শিশুদের শ্রমিক হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

৪. **প্রযুক্তিগত এবং অনুসন্ধানগত ঘাটতি**

- **অনুসন্ধানে ঘাটতি:** সোনা বা তামার মতো **গভীর স্তরের খনিজ** (Deep-Seated Mining) উত্তোলনের জন্য প্রয়োজনীয় গবেষণা ও উন্নয়ন (R&D) এবং উন্নত প্রযুক্তির অভাব ভারতে রয়েছে। ফলে খনন কাজ মূলত উপরিভাগেই সীমাবদ্ধ।
- **উপাত্ত ও মানচিত্র সমস্যা:** পুরনো আমলের ভূ-তাত্ত্বিক উপাত্তের কারণে নতুন অনুসন্ধানকারী সংস্থাগুলো খনিজ ব্লকের বাণিজ্যিক সম্ভাবনা সঠিকভাবে মূল্যায়ন করতে পারে না।

৫. **অবৈধ খনন এবং অশুভ আঁতাত**

- **ব্যাপক অবৈধতা:** স্থানীয় ঠিকাদারদের একটি অশুভ আঁতাত বালি এবং অন্যান্য গৌণ খনিজের ব্যাপক অবৈধ খনন চালাচ্ছে, যা বাস্তুসংস্থানের ক্ষতি করার পাশাপাশি সরকারের বিশাল **রাজস্ব ক্ষতি** ঘটাচ্ছে।
- **নজরদারিতে ঘাটতি:** মাইনিং সার্ভেইল্যান্স সিস্টেম (MSS) থাকা সত্ত্বেও, প্রত্যন্ত এলাকার ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা খনিগুলোতে নজরদারি চালানো রাজ্য প্রশাসনের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

কেস স্টাডি: মেঘালয়ের র‍্যাট-হোল মাইনিং

সরু সুড়ঙ্গের মাধ্যমে অবৈধ এবং অবৈজ্ঞানিক খনন পদ্ধতি ঘন ঘন দুর্ঘটনা এবং পরিবেশের মারাত্মক ক্ষতি ডেকে এনেছে। **ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইব্যুনাল** (NGT) এটি নিষিদ্ধ করেছে, যা স্থানীয় জীবিকা বনাম নিরাপত্তা ও পরিবেশ রক্ষার সংঘাতকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরে।

সংস্কারে সরকারের উদ্যোগ

- MMDR **সংশোধনী (২০২৩ ও ২০২৫):** লিথিয়াম ও কোবাল্টের মতো **গুরুত্বপূর্ণ খনিজ** খাতকে বেসরকারি বিনিয়োগের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। গভীর স্তরের খনিজের জন্য এক্সপ্লোরেশন লাইসেন্স (EL) চালু এবং সম্পদের সঠিক ব্যবহারে খনি এলাকা বাড়ানোর অনুমতি দেওয়া হয়েছে।
- **জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ খনিজ মিশন (২০২৫):** দেশের ভেতরে অনুসন্ধান, KABIL-এর মাধ্যমে বিদেশে খনিজ সম্পদ অর্জন এবং স্থানীয়ভাবে প্রক্রিয়াকরণ হাব তৈরির মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব জ্বালানি সরবরাহ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।
- PMKKKY: প্রধানমন্ত্রী খনিজ ক্ষেত্র কল্যাণ যোজনা একটি বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা, যার মাধ্যমে খনির রয়্যালটি থেকে পাওয়া অর্থ খনি প্রভাবিত জেলার মানুষের স্বাস্থ্য, জল এবং শিক্ষার উন্নয়নে ব্যবহার করা হয়।
- **স্টার রেটিং এবং S-3 কৌশল:** এটি একটি স্থায়িত্ব কাঠামো যা পরিবেশগত এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার ভিত্তিতে খনিগুলোকে রেটিং দেয়, যাতে **টেকসই খনন** পদ্ধতি উৎসাহিত হয়।
- MSS **এবং সশক্ত (Sashakt) পোর্টাল:** স্যাটেলাইট-ভিত্তিক নজরদারি এবং ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারের মাধ্যমে খনি বরাদ্দ স্বচ্ছ করা এবং অবৈধ খনন বন্ধে রিয়্যাল-টাইম ব্যবস্থা গ্রহণ।

আগামীর পথ

- **গভীর স্তরের অনুসন্ধান:** উন্নত মানচিত্র এবং প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সোনা ও তামার মতো খনিজ উত্তোলনে জোর দেওয়া এবং নতুন বিনিয়োগকারীদের উৎসাহিত করা।
- **বৃত্তাকার অর্থনীতি** (Circular Economy): ই-বর্জ্য থেকে লিথিয়াম/কোবাল্ট পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে **"নগর খনির"** (Urban Mining) প্রসার ঘটানো, যাতে পরিবেশের ওপর চাপ কমে এবং ২০৭০ সালের 'নেট-জিরো' লক্ষ্য পূরণ হয়।

- **সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা ও ESG:** স্বচ্ছ DMF তহবিল ব্যয় এবং কঠোর পরিবেশগত ও সামাজিক (ESG) নিয়ম পালনের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণকে অংশীদার হিসেবে গড়ে তোলা।
- **মূল্য সংযোজন ও প্রক্রিয়াকরণ:** কাঁচা আকরিক রপ্তানির বদলে দেশে প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র তৈরি করা, যা ভারতের কৌশলগত স্বনির্ভরতা এবং **"মেক ইন ইন্ডিয়া"** উদ্যোগকে শক্তিশালী করবে।
- **প্রশাসনিক সহজীকরণ:** বন ও পরিবেশ সংক্রান্ত সব ছাড়পত্র একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ডিজিটাল পদ্ধতিতে সম্পন্ন করার জন্য কার্যকর **"সিঙ্গেল উইন্ডো"** ব্যবস্থা চালু করা।

উপসংহার

ভারতের শিল্প উন্নয়ন এবং **২০৭০ সালের নেট-জিরো** লক্ষ্যের জন্য খনি খাত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহারের সাথে পরিবেশ সুরক্ষা এবং জনকল্যাণের ভারসাম্য বজায় রাখতে পারলেই খনিজ নিরাপত্তা ও একটি শক্তিশালী **আত্মনির্ভর ভারত** নিশ্চিত হবে।

Q. Despite India being one of the countries of the Gondwanaland, its mining industry contributes much less to Gross Domestic Product (GDP) in percentage. Discuss. 10 Marks

***

Scan to know more about our courses...

IAS 2-Year GS PCM | IAS 10-Month GS PCM | Degree + IAS | Prelims Test Series

সাধারণ অধ্যয়ন ২

2.1. রাষ্ট্রনীতি ও শাসনব্যবস্থা

2.1.1. শবরীমালা মন্দির প্রবেশ মামলা এবং রিভিউ পিটিশন

প্রেক্ষাপট:

শবরীমালা মন্দির প্রবেশ মামলা সমসাময়িক ভারতের অন্যতম গভীর সাংবিধানিক দ্বিধা— **ধর্মীয় স্বাধীনতা** এবং **লিঙ্গ সমতা**-র মধ্যে দ্বন্দ্বকে তুলে ধরে। ২০১৮ সালে **'ইন্ডিয়ান ইয়ং লয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন বনাম কেরালা রাজ্য'** মামলার রায় শুধুমাত্র একটি মন্দিরে মহিলাদের প্রবেশের অধিকার নিয়েই ছিল না; এটি **ধারা ২৫-২৬**-এর পরিধি, **অপরিহার্য ধর্মীয় আচরণ** (ERP) তত্ত্ব এবং সমাজ সংস্কারে বিচার বিভাগের ভূমিকা নিয়ে মৌলিক প্রশ্নগুলো পুনরায় সামনে এনেছে।

ধর্মনিরপেক্ষতার বিবর্তন

১. **ধর্মনিরপেক্ষতার তুলনামূলক মডেলসমূহ**

- **মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র** ("Wall of Separation"): এটি প্রথম সংশোধনীর ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে; এখানে রাষ্ট্র ও ধর্ম একে অপরের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে না। এটি **নেতিবাচক স্বাধীনতার** ওপর জোর দেয়—অর্থাৎ ধর্মীয় আচরণকে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ থেকে রক্ষা করা।
- **ফ্রান্স** ("Laïcité"): ধর্মীয় আধিপত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মাধ্যমে এর জন্ম; এটি ধর্মকে সম্পূর্ণ **ব্যক্তিগত বিষয়** হিসেবে গণ্য করে। রাষ্ট্র জনসমক্ষে ধর্মীয় প্রতীক (যেমন হিজাব বা বড় ক্রুশ) নিষিদ্ধ করে রাষ্ট্রের **সর্বোচ্চতা** বজায় রাখে।
- **ভারত** ("Principled Distance"): এটি **'সর্ব ধর্ম সমভাব'** (সব ধর্মের প্রতি সমান শ্রদ্ধা) আদর্শের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। রাষ্ট্র একটি **'নীতিগত দূরত্ব'** বজায় রাখে, যা সমাজ সংস্কারের জন্য (যেমন তিন তালাক নিষিদ্ধ করা) **ইতিবাচক হস্তক্ষেপে** এবং ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আর্থিক সহায়তা প্রদানে বাধা দেয় না।

২. **ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতার বিবর্তন**

- **প্রথম পর্যায়: ঔপনিবেশিক ও জাতীয়তাবাদী ভিত্তি**
  - **প্রেক্ষাপট:** ব্রিটিশদের 'ভাগ করো এবং শাসন করো' নীতির মোকাবিলা করে একটি বহুত্ববাদী সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়োজন ছিল।
  - **সিদ্ধান্ত:** গণপরিষদ ধর্ম ও রাষ্ট্রের 'কঠোর পৃথকীকরণ' প্রত্যাখ্যান করেছিল, যাতে অস্পৃশ্যতার মতো ধর্মীয় কুসংস্কার দূর করতে রাষ্ট্র সংস্কারমূলক পদক্ষেপ নিতে পারে।
- **দ্বিতীয় পর্যায়: অপরিহার্য ধর্মীয় আচরণ (ERP) যুগ (১৯৫৪-১৯৮০-এর দশক)**
  - **শিরুর মঠ মামলা (১৯৫৪):** সুপ্রিম কোর্ট **অপরিহার্য ধর্মীয় আচরণ** (ERP) তত্ত্বটি সংজ্ঞায়িত করে; রাষ্ট্র ধর্মের 'ধর্মনিরপেক্ষ' দিকগুলো (অর্থ/প্রশাসন) নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, তবে 'অপরিহার্য' আচার-অনুষ্ঠান রক্ষা করতে বাধ্য।
  - **এস.আর. বোম্মাই (১৯৯৪):** ৪২তম সংশোধনীকে সমর্থন করে আদালত ঘোষণা করে যে, ধর্মনিরপেক্ষতা সংবিধানের **মৌলিক কাঠামোর** (Basic Structure) অংশ।
- **তৃতীয় পর্যায়: রূপান্তরমূলক সাংবিধানিকতা (২০১৫-বর্তমান)**
  - **পরিবর্তন:** অগ্রাধিকার এখন 'ঐতিহ্য' থেকে সরে গিয়ে **ব্যক্তিগত মর্যাদা (ধারা ১৪, ১৫, ২১)**-এর ওপর জোর দিচ্ছে।

- **শবরীমালা (২০১৮):** আদালত প্রতিষ্ঠা করে যে, **'সাংবিধানিক নৈতিকতা'** যেকোনো অপরিহার্য আচরণের ঊর্ধ্বে; এখন ব্যক্তিগত অধিকার গোষ্ঠীগত বা সাম্প্রদায়িক স্বায়ত্তশাসনের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

তুলনা: ধারা ২৫ বনাম ধারা ২৬

বৈশিষ্ট্য	ধারা ২৫	ধারা ২৬
মূল লক্ষ্য	**ব্যক্তিগত অধিকার:** ব্যক্তিকে রক্ষা করে।	**গোষ্ঠীগত অধিকার:** 'ধর্মীয় সম্প্রদায়কে' রক্ষা করে।
প্রযোজ্যতা	**"সকল ব্যক্তির"** জন্য (নাগরিক এবং অ-নাগরিক)।	প্রতিটি ধর্মীয় সম্প্রদায় বা তার **যেকোনো শাখার** জন্য।
প্রাথমিক পরিধি	বিবেকের স্বাধীনতা; ধর্ম গ্রহণ, পালন ও প্রচারের অধিকার।	ধর্মীয় কার্যাবলি পরিচালনা, সম্পত্তি কেনা এবং প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অধিকার।
সীমাবদ্ধতা	জনশৃঙ্খলা, নৈতিকতা, স্বাস্থ্য **এবং অন্যান্য মৌলিক অধিকার।**	জনশৃঙ্খলা, নৈতিকতা এবং স্বাস্থ্য (সরাসরি অন্যান্য মৌলিক অধিকারের অধীনে নয়)।
রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ	রাষ্ট্রকে ধর্মনিরপেক্ষ কাজ নিয়ন্ত্রণ এবং **সমাজ সংস্কারের** ক্ষমতা দেয়।	ধর্মের **নিজস্ব বিষয়ে** রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ থেকে স্বায়ত্তশাসন রক্ষা করে।

অপরিহার্য ধর্মীয় আচরণ (ERP) তত্ত্ব

ERP **তত্ত্ব** হলো ভারতীয় আদালত কর্তৃক ব্যবহৃত একটি বিচার বিভাগীয় হাতিয়ার, যার মাধ্যমে নির্ধারণ করা হয় কোন ধর্মীয় আচরণগুলো ধর্মের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং সংবিধানের **ধারা ২৫ ও ২৬**-এর অধীনে সংরক্ষিত।

১. উৎপত্তি ও বিবর্তন

- **শিরুর মঠ মামলা (১৯৫৪):** সুপ্রিম কোর্ট জানায় যে, কোনো আচরণ 'অপরিহার্য' কি না তা শুধুমাত্র সম্প্রদায়ের দাবির ওপর ভিত্তি করে নয়, বরং ধর্মের মূল নথিপত্র ও তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে আদালত নির্ধারণ করবে।
- **উদ্দেশ্য: পবিত্র আচার-অনুষ্ঠান** (যা সংরক্ষিত) এবং **ধর্মনিরপেক্ষ কার্যাবলি** (যা রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, যেমন আর্থিক ব্যবস্থাপনা)-এর মধ্যে পার্থক্য করা।

২. অপরিহার্যতা যাচাইয়ের পরীক্ষা

একটি ধর্মীয় আচরণকে ERP হিসেবে গণ্য হতে হলে নিম্নলিখিত শর্তগুলো পূরণ করতে হবে:

- **অপরিহার্যতা (Indispensability):** এই আচারটি বাদ দিলে কি ধর্মের মৌলিক চরিত্র বদলে যাবে?
- **ধর্মীয় ভিত্তি:** আচারটি কি ধর্মের মূল গ্রন্থ বা দীর্ঘকালীন ঐতিহ্যের দ্বারা সমর্থিত?
- **অবিচ্ছেদ্যতা:** এটি কি কোনো গৌণ বা ঐচ্ছিক আচারের বদলে একটি **মৌলিক বিশ্বাস**?

৩. বর্তমান বিচার বিভাগীয় পরিবর্তন (২০১৫-বর্তমান)

এই তত্ত্বটি এখন স্রেফ ঐতিহ্য রক্ষা নয়, বরং **সমাজ সংস্কারের** একটি হাতিয়ার হয়ে উঠেছে:

- **আচার থেকে যুক্তি:** আগে আদালত অধিকাংশ আচারকে রক্ষা করত। এখন আদালত সেগুলোকে **সাংবিধানিক নৈতিকতার** মাপকাঠিতে বিচার করে।
- **অধিকারের সাথে দ্বন্দ্ব:** যদি কোনো আচরণ (তা 'অপরিহার্য' হলেও) **ধারা ১৪ (সমতা)** বা **ধারা ২১ (মর্যাদা)** লঙ্ঘন করে, তবে আদালত তা বাতিল করতে পারে (যেমন- শবরীমালা মামলা, তিন তালাক)।

- **উচ্চ মানদণ্ড:** সাম্প্রতিক মামলাগুলোতে (আদি শৈব শিবাচারিয়াগল) সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে যে, প্রাক-সাংবিধানিক প্রথাগুলোও সুরক্ষা পাবে না যদি না সেগুলো ধর্মের মূল পরিচয়ের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়।

সুপ্রিম কোর্টের রায়ের প্রভাব

১. আইনি ও বিচার বিভাগীয় প্রভাব

- **সাংবিধানিক নৈতিকতা (Constitutional Morality):** ধারা ২৫ এবং ২৬-এর অধীনে 'নৈতিকতা' শব্দটিকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। এর অর্থ এখন কোনো ধর্মীয় বা ব্যক্তিগত আদর্শ নয়, বরং **সাম্য, স্বাধীনতা এবং মর্যাদা**-র মতো সাংবিধানিক মূল্যবোধ।
- **ERP স্ক্রুটিনি (ERP Scrutiny):** অপরিহার্য ধর্মীয় আচরণ (ERP) প্রমাণের মানদণ্ড আরও কঠোর করা হয়েছে। এখন কোনো আচরণকে সংরক্ষিত হতে হলে তাকে ধর্মের জন্য **'অপরিহার্য' বা 'অনিবার্য'** হতে হবে। বৈষম্যমূলক প্রথাগুলোকে 'অনগ্রসর আচার' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।
- **ধারা ১৭-এর সম্প্রসারণ:** 'অস্পৃশ্যতা' দূরীকরণের পরিধি বাড়ানো হয়েছে। শুধুমাত্র জাতপাত নয়, বরং ঋতুস্রাবের মতো **শারীরিক বা জৈবিক কারণে** সামাজিক বর্জনকেও অস্পৃশ্যতার আওতায় আনা হয়েছে।

২. প্রাতিষ্ঠানিক প্রভাব

- **সীমিত স্বায়ত্তশাসন:** আইয়াপ্পা ভক্তদের 'আলাদা ধর্মীয় সম্প্রদায়' (Denomination) হিসেবে স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করা হয়েছে। এর মাধ্যমে বার্তা দেওয়া হয়েছে যে, সমতার আইন এড়ানোর জন্য কোনো গোষ্ঠী **ধারা ২৬**-এর দোহাই দিতে পারবে না।
- **প্রশাসনিক সংস্কার:** কেরালা হিন্দু প্লেসেস অফ পাবলিক ওয়ারশিপ রুলস (১৯৬৫)-এর **বিধি ৩(খ)** বাতিল করা হয়েছে, যা প্রথার নামে লিঙ্গভিত্তিক বর্জনকে আইনি বৈধতা দিত।

৩. সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রভাব

- **বিশ্বাস বনাম আইন:** একটি গভীর ধর্মীয় সমাজে, দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যের বিরোধী আইনি নির্দেশ প্রায়ই জনরোষের মুখে পড়ে। ফলে বাস্তবে এই আইনগুলো কার্যকর করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।
- **মেরুকরণ:** কেরালার এই রায় ব্যাপক জনবিক্ষোভের সৃষ্টি করেছিল; সমালোচকরা একে সনাতন বিশ্বাসের ওপর ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের **'অনুপ্রবেশ'** হিসেবে দেখেন।
- **প্রতিরোধ:** বাস্তবায়নে ব্যাপক চ্যালেঞ্জের কারণে ৬০টিরও বেশি রিভিউ পিটিশন জমা পড়ে, যার ফলে বর্তমানের এই **নয়জন বিচারপতির বেঞ্চ** গঠন করতে হয়েছে।

৪. 'শবরীমালা লিগ্যাসি' (The Sabarimala Legacy)

- **বিস্তৃত পর্যালোচনা:** এটি একটি 'প্যান্ডোরার বক্স' খুলে দিয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট এখন অন্যান্য ধর্মের অনুরূপ বিষয়গুলো পরীক্ষা করতে পারছে (যেমন: **মসজিদে মহিলাদের প্রবেশ, পার্সি অগ্নি মন্দিরে প্রবেশ**, এবং দাউদি বোহরা সম্প্রদায়ের মধ্যে **মহিলাদের খৎনা বা FGM** প্রথা)।
- **প্রকৃত সমতা (Substantive Equality):** বিচার বিভাগ এখন শুধু 'কাগজে-কলমে সমতা' নয়, বরং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের ভেতরে থাকা **কাঠামোগত শোষণ** দূর করার দিকে মনোযোগ দিচ্ছে।

ভবিষ্যতের পথ

১. সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যাখ্যা (Harmonious Construction)

- এমন একটি **'মধ্যপন্থা'** খুঁজুন যেখানে ধারা ২৫ (ব্যক্তিগত অধিকার) এবং ধারা ২৬ (গোষ্ঠীর স্বায়ত্তশাসন) একসাথে সহাবস্থান করতে পারে।

- ধর্মীয় স্বায়ত্তশাসনকে ততক্ষণই সম্মান করা উচিত যতক্ষণ না তা মানুষের মর্যাদা এবং সমতার মৌলিক নীতি লঙ্ঘন করে।

২. ERP তত্ত্বের সংস্কার

- **বিচার বিভাগীয় সংযম:** ধর্মগ্রন্থের ব্যাখ্যা দেওয়ার বদলে আদালতকে এটি দেখতে হবে যে, কোনো প্রথা ক্ষতিকারক বা বৈষম্যমূলক কি না।
- **ভারসাম্যপূর্ণ অনুসন্ধান:** কোনো আচার অপরিহার্য কি না তা নির্ধারণ করতে প্রাচীন গ্রন্থের পাশাপাশি বর্তমান সমাজের **'জীবন্ত বিশ্বাস'** (Living Faith) বিবেচনা করা উচিত।

৩. প্রকৃত সমতা প্রতিষ্ঠা

- ধর্মীয় স্থানের ভেতরে থাকা কাঠামোগত পিতৃতন্ত্র এবং ঐতিহাসিক বর্জনকে নির্মূল করতে হবে।
- নিশ্চিত করতে হবে যেন **'প্রথা'** শব্দটিকে বৈষম্যমূলক আচরণের রক্ষাকবচ হিসেবে ব্যবহার করা না হয়।

৪. অভ্যন্তরীণ সংস্কার ও আইনি পদক্ষেপ

- **রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব:** রাষ্ট্রকে কেবল আদালতের রায়ের ওপর নির্ভর না করে **ধারা ২৫(২)** অনুযায়ী আইনের মাধ্যমে সামাজিক সংস্কার ত্বরান্বিত করতে হবে।
- **সামাজিক সংলাপ:** ধর্মীয় নেতাদের নেতৃত্বে অভ্যন্তরীণ সংস্কারকে উৎসাহিত করতে হবে যাতে সামাজিক প্রতিরোধ কমে এবং পরিবর্তন দীর্ঘস্থায়ী হয়।

৫. সাংবিধানিক নৈতিকতার সংজ্ঞা নির্ধারণ

- নয়জন বিচারপতির বেঞ্চকে **'সাংবিধানিক নৈতিকতা'**-র একটি সুস্পষ্ট ও বস্তুনিষ্ঠ সংজ্ঞা দিতে হবে।
- এটি একটি স্থিতিশীল আইনি মানদণ্ড তৈরি করবে এবং বিচার বিভাগীয় অতি-সক্রিয়তার অভিযোগ দূর করবে।

উপসংহার

সুপ্রিম কোর্ট যখন রূপান্তরমূলক ন্যায়বিচার (Transformative Justice) প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছে, তখন **হবস-এর সামাজিক চুক্তি** (Social Contract) তত্ত্ব সতর্ক করে যে—গভীর বিশ্বাসের বিষয়ে বিচার বিভাগীয় হস্তক্ষেপ সামাজিক শৃঙ্খলাকে অস্থিতিশীল করার ঝুঁকি রাখে। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বা 'লেভিয়াথান'-দের ওপর জোরপূর্বক ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কার চাপিয়ে দিলে সেই সাম্প্রদায়িক স্থিতিশীলতা নষ্ট হতে পারে, যা রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে রাষ্ট্র গঠিত হয়েছিল।

Q. Judicial intervention in religious matters raises concerns of overreach as well as necessity. Discuss the challenges involved and suggest a way forward. 15 Word

2.1.2. মৃত্যুদণ্ড এবং "মধ্যপন্থা"

প্রেক্ষাপট

সম্প্রতি সাত্তানকুলামে পুলিশ হেফাজতে মৃত্যুর ঘটনায় (CBI বনাম শ্রীধর) মাদুরাইয়ের একটি ট্রায়াল কোর্ট নয়জন বরখাস্ত হওয়া পুলিশ সদস্যকে **মৃত্যুদণ্ড** প্রদান করেছে। এই রায়টি একদিকে যেমন পুলিশের বর্বরতার বিরুদ্ধে একটি কঠোর বার্তা হিসেবে দেখা হচ্ছে, অন্যদিকে এটি ভারতের আদালতগুলোর সাজা প্রদানের ক্ষেত্রে একটি বড় ধরনের **"সাজা প্রদানের ফাঁদ"**-কে সামনে নিয়ে এসেছে।

অন্তর্বর্তীকালীন সাজার বিবর্তনকাল

বিচার বিভাগ যখন থেকে শুধুমাত্র "যাবজ্জীবন বনাম মৃত্যুদণ্ড"—এই দুই বিকল্পের বদলে একটি **ত্রি-স্তরীয় মডেলে** (তিনটি বিকল্প) দিকে যাত্রা শুরু করেছে, তখন থেকেই এই **"মধ্যপন্থা"** বা "Middle Ground"-এর ধারণাটি গড়ে উঠেছে।

- **১৯৮০: বচ্চন সিং বনাম পাঞ্জাব রাজ্য**

  এই মামলার মাধ্যমেই **"বিরলতম থেকে বিরলতম"** (Rarest of Rare) তত্ত্বটি প্রতিষ্ঠিত হয়। আদালত রায় দেয় যে, মৃত্যুদণ্ড কেবল তখনই দেওয়া উচিত যখন যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের বিকল্পটি "নিশ্চিতভাবে বন্ধ" হয়ে যায়। এর ফলে যাবজ্জীবনের চেয়েও কঠোর কোনো বিকল্পের প্রয়োজনীয়তা তৈরি হয়।

- **২০০৮: স্বামী শ্রদ্ধানন্দ বনাম কর্ণাটক রাজ্য**

  আদালত সাজা প্রদানের ক্ষেত্রে একটি **"শূন্যতা"** খুঁজে পায়। দেখা যায় যে, সাধারণ যাবজ্জীবন কারাদণ্ড মানে অনেক ক্ষেত্রেই ১৪ বছর পর আসামির মুক্তি। আদালত তখন একটি **"বিশেষ বিভাগ"** বা স্পেশাল ক্যাটাগরি তৈরি করে: একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের (যেমন ২০-৩০ বছর) জন্য যাবজ্জীবন অথবা আমৃত্যু কারাদণ্ড, যেখানে কোনো সাজা কমানো বা রেহাই (Remission) পাওয়া যাবে না।

- **২০১৫: ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া বনাম ভি. শ্রীহরণ**

  সুপ্রিম কোর্টের একটি সাংবিধানিক বেঞ্চ এই "মধ্যপন্থাকে" আনুষ্ঠানিক রূপ দেয়, কিন্তু এর প্রয়োগের ওপর সীমাবদ্ধতা আরোপ করে। আদালত রায় দেয় যে, এই বিশেষ সাজা দেওয়ার ক্ষমতা কেবল **হাইকোর্ট** এবং **সুপ্রিম কোর্টের** হাতে থাকবে; ট্রায়াল কোর্ট বা নিম্ন আদালতগুলো এই সাজা দিতে পারবে না।

- **২০২২: মনোজ বনাম মধ্যপ্রদেশ রাজ্য**

  এই রায়টি সাজা প্রদানের প্রক্রিয়ার ওপর জোর দেয়। এটি বাধ্যতামূলক করে যে, মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার আগে আদালতকে আসামির **লঘুকারী পরিস্থিতি** (যেমন মানসিক স্বাস্থ্য, সামাজিক ইতিহাস) গুরুত্বের সাথে তদন্ত করতে হবে। এটি সাজার একটি সুশৃঙ্খল পথ তৈরির প্রয়োজনীয়তাকে আরও শক্তিশালী করে।

- **২০২৫: কিরণ বনাম কর্ণাটক রাজ্য**

  আদালত পুনরায় 'শ্রীহরণ' মামলার সীমাবদ্ধতাকে নিশ্চিত করে। পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেওয়া হয় যে, সেসন কোর্ট বা দায়রা আদালতগুলো **"১৪ বছরের কারাদণ্ড এবং মৃত্যুদণ্ডের মধ্যবর্তী ব্যবধান"** ঘোচাতে পারবে না। এর ফলে একটি "ভাঙা মই"-এর মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, যেখানে মধ্যপন্থা বা মাঝখানের সাজাটি কেবল আপিল পর্যায়েই পাওয়া সম্ভব।

ট্রায়াল কোর্টের সাজা প্রদানের ক্ষমতার মূল সমস্যা

"মধ্যপন্থা" বা "Middle Ground" বিরোধাভাস (The Paradox)

সাজা প্রদানের কাঠামোর এই **বিরোধাভাস** বলতে এমন একটি আইনি শূন্যতাকে বোঝায়, যেখানে একজন বিচারককে দুটি চরম বিকল্পের (১৪ বছরের জেল অথবা মৃত্যুদণ্ড) মধ্যে একটি বেছে নিতে হয়, যদিও সেখানে একটি যৌক্তিক তৃতীয় বিকল্প বিদ্যমান থাকে।

১. **শাস্তির তিনটি স্তর**

তাত্ত্বিকভাবে ভারতের আইনে শাস্তির তিনটি স্তর স্বীকৃত, কিন্তু যারা প্রথম প্রমাণাদি যাচাই করেন (ট্রায়াল কোর্ট), তাদের কাছে কেবল দুটি স্তর উন্মুক্ত থাকে।

- **স্তর ১: সাধারণ যাবজ্জীবন কারাদণ্ড:** টেকনিক্যালি এটি "মৃত্যু পর্যন্ত" জেল হলেও বাস্তবে CrPC-র ৪৩৩এ ধারা অনুযায়ী ১৪ বছর পর রাজ্য সরকার সাজা কমিয়ে আসামিকে মুক্তি দিতে পারে।
- **স্তর ২: "মধ্যপন্থা":** একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড (যেমন ৩০ বছর), যেখানে সাজা কমানোর কোনো সুযোগ নেই।

- **স্তর ৩: মৃত্যুদণ্ড:** অর্থাৎ ফাঁসি।

২. বিরোধাভাসের প্রকৃতি

এই বিরোধাভাসটি তৈরি হয়েছে ২০১৫ সালের শ্রীহরণ রায়ের **এখতিয়ারগত বাধার** কারণে:

- **ক্ষমতার ব্যবধান:** ট্রায়াল কোর্টের একজন মানুষের জীবন কেড়ে নেওয়ার ক্ষমতা (মৃত্যুদণ্ড) আছে, কিন্তু একজনের জীবনের সীমানা নির্দিষ্ট করার ক্ষমতা (রেহাই ছাড়াই নির্দিষ্ট মেয়াদের জেল) নেই।
- **হয় সব, না হয় কিছুই না:** যদি কোনো অপরাধ ১৪ বছরের সাজার জন্য অত্যন্ত জঘন্য হয়, কিন্তু আবার "বিরলতম থেকে বিরলতম" পর্যায়েও না পড়ে, তবে বিচারক ফাঁদে পড়ে যান। তিনি আইনত এই "মধ্যপন্থা" বেছে নিতে পারেন না।
- **পরিণতি:** একটি জঘন্য অপরাধের ক্ষেত্রে মাত্র ১৪ বছরের "নরম" সাজা এড়াতে বিচারকরা অনেক সময় **মৃত্যুদণ্ড** দিতে বাধ্য বোধ করেন।

এখতিয়ারগত বাধা: ট্রায়াল কোর্ট বনাম সাংবিধানিক আদালত

ভারতের বিচার ব্যবস্থায় মৃত্যুদণ্ডের মামলার ক্ষেত্রে দ্বিমুখী ব্যবস্থা কাজ করে। যদিও উভয় স্তরের আদালতই মৃত্যুদণ্ড দিতে পারে, কিন্তু "মধ্যপন্থা" বা নির্দিষ্ট মেয়াদের কারাদণ্ড কঠোরভাবে বিভাজিত।

বৈশিষ্ট্য	ট্রায়াল কোর্ট (সেসন আদালত)	সাংবিধানিক আদালত (হাইকোর্ট/সুপ্রিম কোর্ট)
মৃত্যুদণ্ড	দিতে পারে (হাইকোর্টের অনুমোদন সাপেক্ষে—CrPC ৩৬৬ / BNSS ৪০৭ অনুযায়ী)।	দিতে পারে অথবা বহাল রাখতে পারে।
সাধারণ যাবজ্জীবন	দিতে পারে (১৪ বছর পর রাজ্য সরকার সাজা কমাতে পারে)।	দিতে পারে।
নির্দিষ্ট মেয়াদের যাবজ্জীবন	**কঠোরভাবে নিষিদ্ধ** (রেহাই ছাড়া ২০, ৩০ বা ৪০ বছরের জেল দিতে পারে না)।	**অনুমোদিত** (রেহাই ছাড়াই "আমৃত্যু" বা নির্দিষ্ট মেয়াদের জেল দিতে পারে)।

সাজা প্রদানের সংস্কারে প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ

ভারতের সাজা প্রদানের কাঠামো বেশ কিছু কাঠামোগত বাধার সম্মুখীন, যার ফলে মৃত্যুদণ্ডের মামলাগুলোতে **"বিচার বিভাগীয় খামখেয়ালিপনা"** (judicial arbitrariness) দেখা দেয়:

১. **"সাজা প্রদানের সরঞ্জামের" অভাব ও বিধিবদ্ধ কঠোরতা:** বর্তমান আইন (CrPC/BNSS) কেবল দুটি চরম বিকল্প দেয়: যাবজ্জীবন কারাদণ্ড অথবা মৃত্যুদণ্ড। ২০১৫ সালের **'শ্রীহরণ'** মামলার সীমাবদ্ধতা ট্রায়াল কোর্ট বা বিচার বিভাগীয় আদালতগুলোকে **"মধ্যপন্থা"** (রেহাই ছাড়াই নির্দিষ্ট মেয়াদের কারাদণ্ড) গ্রহণে বাধা দেয়। এর ফলে বিচারকরা "হয় সব, না হয় কিছুই না"—এমন একটি দ্বিধায় পড়েন, যা অনেক সময় অপরাধীকে কম সাজা থেকে বাঁচাতে বিচারকদের মৃত্যুদণ্ড দিতে বাধ্য করে।

২. **লঘুকারী পরিস্থিতি (Mitigation) অনুসন্ধানে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যর্থতা:** ২০২২ সালের **'মনোজ'** মামলার নির্দেশনায় "প্রবেশন অফিসারের রিপোর্ট" এবং আসামির মনস্তাত্ত্বিক প্রোফাইল তৈরি বাধ্যতামূলক করা হলেও, নালসার (NALSAR)-এর 'স্কয়ার সার্কেল ক্লিনিক'-এর তথ্য বলছে যে এগুলোকে প্রায়ই উপেক্ষা করা হয় বা কেবল একটি **"কাগুজে নিয়ম"** হিসেবে পালন করা হয়। ফলে অপরাধীর জীবনের একটি সামগ্রিক চিত্র আদালতের সামনে আসে না।

৩. **"ভাঙা মই" (Broken Ladder) পরিস্থিতি:** বর্তমানে একটি উচ্চ হার দেখা যাচ্ছে যেখানে ট্রায়াল কোর্ট মৃত্যুদণ্ড দিচ্ছে (বিকল্পের অভাবে), কিন্তু পরবর্তীতে উচ্চ আদালত সেই সাজা কমিয়ে দিচ্ছে। এই **"যো-যো" (উত্থান-পতন)** প্রভাব ভুক্তভোগীদের পরিবারের ওপর প্রচণ্ড মানসিক চাপ সৃষ্টি করে এবং আইনি অনিশ্চয়তাকে দীর্ঘায়িত করে।

৪. **বিচারকদের বিবেচনার ক্ষেত্রে অসঙ্গতি:** দারিদ্র্য, মানসিক স্বাস্থ্য বা বয়সের মতো **"লঘুকারী বিষয়গুলো"** বিচারের জন্য কোনো নির্দিষ্ট আইনি কাঠামো না থাকায় সাজা প্রদান প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ 'বিচারক-কেন্দ্রিক' হয়ে পড়ে। এর ফলে একই ধরনের অপরাধে ভিন্ন ভিন্ন বিচারকের ব্যক্তিগত দর্শনের কারণে সাজার ধরনে বিশাল পার্থক্য দেখা যায়।

৫. **পুলিশ ও ফরেনসিক ব্যবস্থার পদ্ধতিগত ঘাটতি:** সাজার নির্ভুলতা সরাসরি পুলিশ সংস্কারের সাথে যুক্ত। সাত্তানকুলাম মামলার মতো ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, দুর্বল ফরেনসিক মান এবং পারিপার্শ্বিক প্রমাণের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা মৃত্যুদণ্ডের সিদ্ধান্তকে ঝুঁকিপূর্ণ করে তোলে; একটি **ভঙ্গুর তদন্ত ভিত্তি** পুরো বিচার ব্যবস্থাকেই দুর্বল করে দেয়।

৬. **এখতিয়ারগত দ্বন্দ্ব বনাম একরূপতা:** সুপ্রিম কোর্ট "একরূপতা" বজায় রাখার জন্য ট্রায়াল কোর্টকে নির্দিষ্ট মেয়াদের সাজা দেওয়ার ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত রেখেছে। সমালোচকদের মতে, একরূপতা আসা উচিত আপিল বিভাগের পর্যালোচনার মাধ্যমে, প্রমাণের সবচেয়ে কাছের আদালতটিকে (ট্রায়াল কোর্ট) তার **এখতিয়ার বা ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করে নয়**।

ভবিষ্যৎ পথ: সাজা প্রদানের কাঠামো সংস্কার

১. **"মধ্যপন্থা"-র আইনি স্বীকৃতি:** বিএনএসএস (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita) সংশোধন করে **"রেহাই বা ক্ষমা ছাড়া নির্দিষ্ট মেয়াদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড"**-কে একটি বিধিবদ্ধ সাজার বিকল্প হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, যা সেসন কোর্টসহ সকল আদালতের জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

২. **সাজা প্রদানের ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ:** ২০১৫ সালের 'শ্রীহরণ' মামলার সীমাবদ্ধতা বাতিল বা সংশোধন করে ট্রায়াল কোর্টগুলোকে সাজার সব ধরনের ক্ষমতা প্রদান করতে হবে। এটি বিচারকদের ১৪ বছরের জেল এবং মৃত্যুদণ্ডের মাঝখানের **"শূন্যতা"** পূরণ করতে সাহায্য করবে।

৩. **লঘুকারী পরিস্থিতি বা মিটিগেশনকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া:** ২০২২ সালের 'মনোজ' মামলার নির্দেশিকাগুলোকে একটি বাধ্যতামূলক ও আদর্শ প্রোটোকলে রূপান্তর করতে হবে। এর মধ্যে **মিটিগেশন ইনভেস্টিগেটর** (সমাজকর্মী ও মনোবিজ্ঞানী) নিয়োগের ব্যবস্থা থাকতে হবে যারা অভিযুক্তের জীবন ইতিহাস সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহে আদালতকে সহায়তা করবে।

৪. **ফরেনসিক এবং তদন্তের বিশুদ্ধতা জোরদার করা:** পুলিশ সংস্কার বাস্তবায়ন করতে হবে যাতে "বিরলতম থেকে বিরলতম" মামলার রায়গুলো পারিপার্শ্বিক প্রমাণ বা নির্যাতনের মাধ্যমে আদায় করা স্বীকারোক্তির বদলে **উন্নত মানের ফরেনসিক প্রমাণের** ওপর ভিত্তি করে হয়। এটি অপূরণীয় বিচার বিভাগীয় ভুলের ঝুঁকি কমাবে।

৫. **একটি সেন্টেন্সিং কাউন্সিল (Sentencing Council) গঠন:** আন্তর্জাতিক মডেলের আদলে একটি স্বাধীন সংস্থা তৈরি করা উচিত যারা **সাজা প্রদানের নির্দেশিকা** তৈরি করবে। এটি বিচারকদের ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের প্রভাব কমিয়ে আনবে এবং সাজার ক্ষেত্রে একটি সামঞ্জস্য নিশ্চিত করবে।

উপসংহার

সাত্তানকুলাম মামলার রায় সাজা প্রদানের ক্ষেত্রে একটি **"ভাঙা মই"**-এর উপস্থিতিকে স্পষ্ট করে। ট্রায়াল কোর্টগুলোকে নির্দিষ্ট মেয়াদের কারাদণ্ড দেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া এবং লঘুকারী পরিস্থিতি অনুসন্ধানের প্রক্রিয়াকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া অত্যন্ত জরুরি, যাতে এই "হয় সব, না হয় কিছুই না"—বিরোধাভাসটির সমাধান হয় এবং একটি আরও **সুশৃঙ্খল ও মানবিক বিচার ব্যবস্থা** নিশ্চিত হয়।

Q. The restriction on trial courts in awarding intermediate sentences (life imprisonment without remission) creates a structural gap in India's criminal justice system. Critically examine in the light of recent judicial developments. 15 Words

***

সাধারণ অধ্যয়ন ৪

3.1. নীতিশাস্ত্র

3.1.1. সম্মতির ঊর্ধ্বে: ক্ষমতা, আইনি অস্পষ্টতা এবং নির্যাতনের নৈতিক মাত্রা

ভূমিকা

- **সম্মতি** (Consent), যাকে প্রায়শই মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে গণ্য করা হয়, তা **ক্ষমতার অসাম্য** (Power asymmetry) এবং **অসহায়ত্বের** (Vulnerability) উপস্থিতিতে ভঙ্গুর হয়ে পড়ে। যখন একজন ব্যক্তির **স্বায়ত্তশাসন** (Autonomy) প্রভাব, নির্ভরতা এবং সামাজিক কন্ডিশনিং দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, তখন "পছন্দ" বা **"চয়েস"** (Choice)-এর ধারণাটি নিজেই অস্পষ্ট হয়ে যায়।
- নির্যাতনের শিকার ব্যক্তিদের বর্ণনা এবং দার্শনিক অন্তর্দৃষ্টি প্রকাশ করে যে, **নির্যাতন** (Abuse) কেবল একটি ব্যক্তিগত কাজ নয়, বরং এটি একটি **পদ্ধতিগত অবস্থা** (Systemic condition)—যা ক্ষমতার কাঠামো, **আইনি শূন্যতা** (Legal gaps) এবং সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে টিকে থাকে। সুতরাং, নৈতিক প্রশ্নটি কেবল 'সম্মতি দেওয়া হয়েছিল কি না' তার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং প্রশ্নটি হলো সেই সম্মতি আদৌ **প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন** (Truly free) ছিল কি না।

বৈধ সম্মতির স্তম্ভসমূহ

১. **সম্মতি বনাম স্বাধীন ইচ্ছা (স্বায়ত্তশাসনের নীতিশাস্ত্র)**

A. **নৈতিক ভিত্তি (কান্টীয় দৃষ্টিভঙ্গি):**

- সম্মতি কেবল তখনই নৈতিকভাবে বৈধ যখন তা **প্রকৃত স্বায়ত্তশাসনের** (Genuine autonomy) ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে।
- ব্যক্তিদের সর্বদা **উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য** (Ends in themselves) হিসেবে বিবেচনা করতে হবে, কেবল নিজের তুষ্টির **উপায়** (Means) হিসেবে নয়।

B. **প্রকৃত সম্মতির শর্তাবলি:**

- **তথ্যসমৃদ্ধ সিদ্ধান্ত গ্রহণ** (Informed decision-making): যা ফলাফল এবং ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করে।
- **যৌক্তিক ক্ষমতা** (Rational capacity): যা স্বাধীন এবং পক্ষপাতহীন চিন্তাভাবনা নিশ্চিত করে।
- **আবেগীয় পরিপক্কতা** (Emotional maturity): যা সম্পর্ককে সমালোচনামূলকভাবে মূল্যায়ন করার ক্ষমতা দেয়।
- **জবরদস্তির অনুপস্থিতি** (Absence of coercion): যা চাপ, ভয় বা প্রভাব থেকে মুক্তি নিশ্চিত করে।

C. **ক্ষমতার ভারসাম্যহীন সম্পর্কে সম্মতির লঙ্ঘন:**

- **বয়সের ব্যবধান:** এটি জ্ঞানীয় এবং আবেগীয় পরিপক্কতাকে সীমিত করে।
- **ক্ষমতার অসাম্য** (Power asymmetry): কর্তৃত্ব, প্রভাব বা নির্ভরতা পছন্দের অধিকারকে সংকুচিত করে।
- **সম্মতিকে প্রভাবিতকারী মনস্তাত্ত্বিক কারণ:**
  - **ভয়:** ক্ষতি বা প্রত্যাখ্যাত হওয়ার আতঙ্ক।
  - **শ্রদ্ধা:** কর্তৃত্ববাদী ব্যক্তিদের আদর্শ হিসেবে কল্পনা করা।

- **বৈধতার আকাঙ্ক্ষা:** অনুমোদনের তীব্র প্রয়োজন।
- **আবেগীয়/অর্থনৈতিক নির্ভরতা:** প্রত্যাখ্যান করার অক্ষমতা।

২. **সম্মতি-জবরদস্তি ধারাবাহিকতা (Consent-Coercion Continuum)**

A. **দ্বৈত ধারণার ঊর্ধ্বে:**

- সম্পর্কগুলোকে কঠোরভাবে 'সম্পূর্ণ সম্মতিক্রমে' বা 'সম্পূর্ণ জবরদস্তিমূলক'—এই দুই ভাগে ভাগ করা যায় না।
- এর পরিবর্তে, এগুলি একটি **ধারাবাহিকতা বা কন্টিনুয়াম (Continuum)**-এর ওপর অবস্থান করে, যেখানে প্রভাব, চাপ এবং ক্ষমতার বিভিন্ন মাত্রা ব্যক্তিগত পছন্দকে প্রভাবিত করে।
- এই ক্ষেত্রে, যা সম্মতি বলে মনে হয় তা আসলে **আংশিক প্রভাবিত বা সীমাবদ্ধ** হতে পারে।

B. **সূক্ষ্ম জবরদস্তির কৌশল:**

- **শোষণের স্বাভাবিকীকরণ (Normalization of exploitation):** ক্ষমতাশালী ব্যক্তি ধীরে ধীরে বিশ্বাস গড়ে তোলেন এবং সময়ের সাথে সাথে অনুপযুক্ত আচরণকে এমনভাবে প্রবর্তন করেন যা স্বাভাবিক বলে মনে হয়।
- **আবেগীয় নির্ভরতা:** ভুক্তভোগী মানসিকভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়ে, ফলে বিচ্ছেদ বা প্রত্যাখ্যানের ভয়ে সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে আসা কঠিন হয়ে পড়ে।
- **মনস্তাত্ত্বিক কন্ডিশনিং:** ক্রমাগত প্রভাবের ফলে ব্যক্তির উপলব্ধি পরিবর্তিত হয়, যা যত্ন এবং নিয়ন্ত্রণের মধ্যবর্তী পার্থক্যকে অস্পষ্ট করে দেয়।

স্বাধীন ইচ্ছা এবং সম্মতির দর্শন

১. **নির্ধারণবাদ (Determinism):** এই মতানুসারে মানুষের কাজ জীববিদ্যা, লালন-পালন এবং সামাজিক পরিবেশ দ্বারা পূর্বনির্ধারিত। ব্যক্তি মনে করতে পারে সে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা তার **নিয়ন্ত্রণের বাইরের কারণ** দ্বারা প্রভাবিত।

২. **লিবার্টারিয়ানিজম (Libertarianism):** এটি বিশ্বাস করে যে মানুষের সম্পূর্ণ **স্বাধীন ইচ্ছা এবং এজেন্সি (Agency)** আছে। এটি বেশিরভাগ **আইনি ব্যবস্থার (Legal systems)** ভিত্তি, যা ধরে নেয় যে সম্মতি দিলে ব্যক্তি তার কাজের জন্য দায়বদ্ধ।

৩. **কমপ্যাটিবিলিজম (Compatibilism):** এটি একটি মধ্যপথ, যা বলে যে **স্বাধীন ইচ্ছা এবং বাহ্যিক প্রভাব** সহাবস্থান করতে পারে। যতক্ষণ কোনো সরাসরি জবরদস্তি নেই, ততক্ষণ সিদ্ধান্তকে "স্বাধীন" বলা যেতে পারে।

সম্মতির ক্ষেত্রে স্বাধীন ইচ্ছার চ্যালেঞ্জসমূহ

১. **কাঠামোগত ক্ষমতার বৈষম্য (সীমিত পছন্দ):** বয়স বা অর্থনৈতিক অবস্থার ওপর ভিত্তি করে তৈরি হওয়া শ্রেণিবিন্যাস স্বাধীন সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতাকে সীমিত করে। এখানে সম্মতি **প্রকৃত স্বেচ্ছামূলক না হয়ে পরিস্থিতিগত (Situational)** হয়ে পড়ে।

২. **আইনি অস্পষ্টতা (শোষণযোগ্য ধূসর এলাকা):** সম্মতির বয়সের বিভিন্নতা এবং অভিন্ন আইনি মানদণ্ডের অভাব **আইনি ফাঁকফোকর (Loopholes)** তৈরি করে, যা অপরাধীরা শোষণের কাজে ব্যবহার করে।

৩. **সামাজিক কন্ডিশনিং (শোষণের স্বাভাবিকীকরণ):** সাংস্কৃতিক আখ্যানগুলো অনেক সময় অসম সম্পর্ককে রোমান্টিক করে তোলে, যা ব্যক্তির সমালোচনামূলক মূল্যায়ন করার ক্ষমতা কমিয়ে দেয়।

৪. **মনস্তাত্ত্বিক সীমাবদ্ধতা (পছন্দের বিকৃত উপলব্ধি):** আবেগীয় নির্ভরতা বা **গ্রুমিং (Grooming)** সিদ্ধান্ত গ্রহণকে প্রভাবিত করে। ভুক্তভোগীরা অনেক সময় নিয়ন্ত্রণকে নিজেদের ইচ্ছা বলে ভুল করে।

৫. **প্রাতিষ্ঠানিক এবং নৈতিক ব্যর্থতা (দুর্বল সুরক্ষা কবচ):** জবাবদিহিতার অভাব এবং প্রতিষ্ঠানের সহমর্মিতাহীন আচরণ দুর্বল ব্যক্তিদের সুরক্ষা দিতে ব্যর্থ হয়, যা **প্রকৃত স্বাধীন ইচ্ছা এবং তথ্যসমৃদ্ধ সম্মতির** (Informed consent) শর্তাবলিকে ধ্বংস করে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা: স্বাধীন ইচ্ছা এবং নৈতিক সম্মতির শক্তিশালীকরণ

১. **স্বচ্ছতা ও সুরক্ষার জন্য আইনি সংস্কার:**

- বিভিন্ন বিচারব্যবস্থার মধ্যে **সম্মতির বয়সের** (Age of consent) আইনি সামঞ্জস্য বিধান করা।
- শোষণে সহায়তা করে এমন **আইনি ফাঁকফোকরগুলি** (Legal loopholes) বন্ধ করা।
- সংবেদনশীলতা এবং সহজলভ্যতা নিশ্চিত করে **ভুক্তভোগী-বান্ধব বিচার ব্যবস্থা** প্রতিষ্ঠা করা।

২. **ক্ষমতার অপব্যবহার রোধে প্রাতিষ্ঠানিক দায়বদ্ধতা:**

- উচ্চপদস্থ বা প্রভাবশালী ব্যক্তিদের জন্য কঠোর **জবাবদিহিতার ব্যবস্থা** নিশ্চিত করা।
- বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে (স্কুল, কর্মক্ষেত্র, সরকারি অফিস) সুনির্দিষ্ট **আচরণবিধি** (Codes of conduct) প্রণয়ন।
- আইন ও বিধি কার্যকর হচ্ছে কি না তা নিশ্চিত করতে স্বাধীন তদারকি সংস্থা গঠন।

৩. **স্বচ্ছতা ও দায়িত্বশীলতা বৃদ্ধিতে নৈতিক শাসন** (Ethical Governance):

- সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে **সততা** (Integrity) **এবং নীতিপরায়ণতা** (Probity) শক্তিশালী করা।
- সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা।
- ক্ষমতাবান ব্যক্তিদের ওপর সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব ও দায়ভার অর্পণ করা।

৪. **দৃষ্টিভঙ্গি ও সামাজিক রীতিনীতির রূপান্তর:**

- **গ্রুমিং** (Grooming), নির্যাতন এবং ক্ষমতার নেতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে জনসচেতনতা তৈরি করা।
- বৈষম্যমূলক সম্পর্ককে স্বাভাবিক করে তোলে এমন সামাজিক কুসংস্কারগুলিকে চ্যালেঞ্জ জানানো।
- শিক্ষার মাধ্যমে **লিঙ্গ সংবেদনশীলতা** (Gender sensitivity) এবং নৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

৫. **মৌলিক নৈতিক মূল্যবোধের প্রসার:**

- **সততা** (Integrity): ক্ষমতার নৈতিক ও দায়িত্বশীল ব্যবহার।
- **সহমর্মিতা** (Empathy): ভুক্তভোগীদের বাস্তব অভিজ্ঞতা ও যন্ত্রণাকে অনুধাবন করা।
- **করুণা** (Compassion): মানসিকভাবে এবং প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সহায়তা প্রদান করা।
- **ন্যায়বিচার** (Justice): সবার জন্য মর্যাদা ও ন্যায্যতা নিশ্চিত করা।
- **দায়িত্বশীলতা** (Responsibility): প্রভাবশালীদের তাদের কাজের জন্য জবাবদিহি করতে বাধ্য করা।

উপসংহার

সম্মতি সংক্রান্ত আলোচনাটি এটিই স্পষ্ট করে যে, ক্ষমতার ভারসাম্যহীনতার প্রেক্ষাপটে সম্মতিকে কেবল একটি একক নৈতিক বা আইনি ঢাল হিসেবে ব্যবহার করা যায় না। সম্মতির মূল্যায়ন অবশ্যই **স্বায়ত্তশাসন** (Autonomy), **মর্যাদা** (Dignity) এবং **ন্যায়বিচারের** (Justice) বৃহত্তর নৈতিক কাঠামোর মধ্যে করতে হবে।

একটি সমাজ যখন নৈতিক শাসনের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়, তখন তাকে কেবল এই প্রশ্নটি করলেই চলে না যে **"সেখানে কি সম্মতি ছিল?"** বরং তাকে জিজ্ঞাসা করতে হবে **"সেই সম্মতির পেছনে কি প্রকৃত স্বাধীনতা, সমতা এবং মর্যাদা ছিল?"** চূড়ান্তভাবে, দুর্বলকে সুরক্ষা দেওয়া এবং প্রভাবশালীদের নৈতিক দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করাই হলো ন্যায়বিচারের প্রকৃত মাপকাঠি।

Q. Consent is meaningful only when it is free from power, coercion, and structural inequalities. In the light of this statement, examine the ethical limitations of consent in power-imbalanced relationships. 150 Word

***

Scan to know more about our courses...

IAS 2-Year GS PCM | **IAS 10-Month GS PCM** | **Degree + IAS** | **Prelims Test Series**

Click here to watch this video